সুরভিত
সাহাবি জীবন

সুরভিত সাহাবি জীবন

জিহাদ তুরবানি

সুকুন পাবলিশিং

সূচিপত্র

প্রকাশকের কথা ৭
সাহাবিদের শিক্ষালয়ে আমরা কেন ছাত্র হলাম.......................................৯
আত্মত্যাগে মহান যারা ২৭
নীতিতে যারা আপসহীন ৪২
স্বপ্ন যাদের আকাশছোঁয়া.. ৫০
তোমরা প্রবৃত্তির দাসত্ব করো না... ৭০
সুন্নাহর অনুসরণ ৭৭
ত্যাগের মহিমায় ভাস্বর যারা ৯১
জুলুমের ব্যাপারে সর্তক যারা.. ১১০
আত্মনিয়ন্ত্রণ ১২২
যাদের গলায় ছিল মুক্তির সুর.. ১৩৯
ফিরে দেখা.. ১৫৫

সাহাবিদের শিক্ষালয়ে আমরা কেন ছাত্র হলাম

'মুহাজির এবং আনসারদের মধ্যে যারা (ঈমান আনয়নে) অগ্রগামী হয়েছেন এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করেছেন, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। আল্লাহ তাদের জন্য এমন উদ্যানরাজি তৈরি করে রেখেছেন, যার তলদেশে নহর বহমান। তারা সর্বদা সেখানে থাকবে। এটাই মহাসাফল্য।'[১]

পৃথিবীর নিকষকালো আকাশ চিরে জাগছে দ্বীনের উজ্জ্বল সূর্য। কেটে যাচ্ছে হাজার বছরের জমাট অন্ধকার। চারদিক ভরে যাচ্ছে আলোয় আলোয়। ভোর হচ্ছে। অসম্ভব সুন্দর সে দৃশ্য। জগৎজুড়ে নেমে এসেছে অফুরন্ত কল্যাণ আর আসমানি বিভা। বিশ্ববীণার তারে জেগেছে নতুন সুর। সে সুর তাওহিদের। সে সুর একাত্মবাদের। কাবার ভেতরের তিনশো ষাটটি মূর্তিও জেনে গেছে, পয়গামে ইলাহির অসীম শক্তিতে শীঘ্রই ধসে পড়বে শিরকের প্রাসাদ। লা-শরিক আল্লাহর দিকে নিরন্তর ডেকে চলেছেন রাসুলুল্লাহ—রাতদিন, বিরামহীন।

সজাগ হয়ে উঠল মক্কার কুরাইশরা। তবে কি শেষ হয়ে যাবে তাদের বাপদাদার রেখে যাওয়া ধর্ম! থেমে কি যাবে কুফরের নিকৃষ্ট মহড়া! তারা সকাল-বিকাল পরামর্শে বসে; কোনো উপায় খুঁজে পায় না। শেষ পর্যন্ত

---

[১] সুরা তাওবা, আয়াত : ১০০

সিদ্ধান্ত হলো, কয়েকজন চৌকশ নেতাকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে পাঠানো হবে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কিছু লোভনীয় প্রস্তাব নিয়ে হাজির হলো তারা। বলল, 'আপনি দাওয়াত দেওয়া বন্ধ করুন। আমরা আরব জাহানের তামাম ঐশ্বর্য আপনার পায়ে লুটিয়ে দেবো।' কিন্তু তিনি অনড়। পাহাড়সম অবিচলতায় মুষ্টিবদ্ধ। দৃঢ়তা ফুটে উঠল তার কণ্ঠে। কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন তাদের প্রস্তাব।

এতে দিশেহারা হয়ে পড়ল তারা। দারুন নদওয়ায় আবারও বৈঠক বসল। খুঁজে বের করতে হবে, কাদের প্রশ্রয়ে আজ এ পর্যন্ত এসেছে সে। সভার মাঝ থেকে বলে উঠল একজন, 'বনু হাশিম আর বনু মুত্তালিবই[1] যত সমস্যার মূল। তারাই তো আশ্রয় দিচ্ছে তাকে। তাদের সমর্থন পেয়েই আজ আমাদের ধর্মের বিরোধিতা শুরু করেছে সে; উপাস্যদের বিরুদ্ধে বলার সাহস পেয়েছে।'

এবার সিদ্ধান্ত হলো, তার সহযোগীদের ওপর চাপ প্রয়োগ করে তাদেরকেও বয়কট করতে হবে। এতে সে আশ্রয় হারিয়ে, সমর্থন না পেয়ে নতুন ধর্মের প্রচার বন্ধ করে দিতে বাধ্য হবে। সভায় কুরাইশ নেতৃবর্গ এই মর্মে অঙ্গীকার করল—তারা কোনো অবস্থাতেই বনু মুত্তালিবের সাথে বেচাকেনাসহ কোনো প্রকার লেনদেন করবে না। তাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করবে না। এরপর তারা একটি অঙ্গীকারনামা লিখে কাবার সাথে ঝুলিয়ে দিলো।

[১] মুত্তালিব ইবনু আবদু মানাফের দিকে সম্পৃক্ত করে গোত্রের নাম বনু মুত্তালিব রাখা হয়েছে, যিনি রাসুলের দাদা আব্দুল মুত্তালিব ইবনু হাশিমের চাচা ছিলেন। আব্দুল মুত্তালিবকে তার চাচা মুত্তালিব ইয়াসরিবের বনু নাজ্জার গোত্রে থাকা তার মামাদের কাছ থেকে নিয়ে এসেছিলেন। তার প্রকৃত নাম শাইবা। (ফিলিস্তিনের) গাযায় হাশিমের মৃত্যুর পর আব্দুল মুত্তালিব তার চাচার কাছে বেড়ে ওঠেন। এর আগে তিনি ইয়াসরিবে তার মায়ের কাছে ছিলেন, যিনি খাজরাজ গোত্রের বনু নাজ্জার শাখার মেয়ে। তার চাচা মুত্তালিব তাকে নিয়ে আসার জন্য ইয়াসরিবে যান। ফেরার পথে মক্কায় প্রবেশের সময় কুরাইশরা তাকে মুত্তালিবের ক্রীতদাস ভেবে বসে। তারা বলতে থাকে, 'আব্দুল মুত্তালিব' বা 'মুত্তালিবের ক্রীতদাস'। তখন মুত্তালিব বলেন, 'না, সে তো আমার ভায়ের ছেলে শাইবা।' সেখান থেকেই তার নাম আব্দুল মুত্তালিব হয়ে যায় এবং জীবনভর মানুষ তাকে এই নামেই চিনত।

আত্মত্যাগে মহান যারা

হে আল্লাহর রাসুল, আল্লাহ আপনাকে যা জানিয়েছেন, আপনি সেভাবেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন। আমরা আপনার সাথে আছি। আল্লাহর কসম, আমরা আপনার সাথে বনি ইসরাইলের মতো আচরণ করব না, যেমনটা তারা মুসা আলাইহিস সালামের সাথে করেছে। বনি ইসরাইলের লোকেরা মুসা আলাইহিস সালামকে বলেছিল, 'যান, আপনি আর আপনার প্রতিপালক গিয়ে যুদ্ধ করুন। আমরা এখানেই বসে পড়লাম।' কিন্তু আমি বলছি, 'আপনি আর আপনার রব যান, আমরা আপনাদের সাথে থেকে লড়াই করব। ওই সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্য নবি হিসেবে পাঠিয়েছেন; যদি আপনি আমাদেরকে বারকুল গিমাদ পর্যন্তও নিয়ে যান, তাহলেও আমরা আপনার সাথে থাকব। আপনি না থামা পর্যন্ত আপনার সাথে থেকে লড়াই চালিয়ে যাব।[১]

মিকদাদ ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু

বদর প্রান্তর। মদিনা থেকে একশো সত্তর কিলোমিটার দূরের একটি উপত্যকা। এখানে একটি কূপের নাম 'বদর'। সে নামেই নামকরণ করা হয়েছে উপত্যকাটির। বদর কূপের দিকে যে রাস্তাটি গেছে, তার পাশে একটি পাথুরে ভূখণ্ডের নাম 'ইরকুয যাবইয়াহ'। সেখানে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাত্রাবিরতি দিলেন। মক্কা থেকে মদিনার দিকে ধাবমান কুরাইশি সেনাবাহিনীর সাথে সরাসরি লড়াইয়ে ব্যাপৃত

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ইবনু কাসির, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৭৯ (দারুল ফিকির)

হওয়ার ব্যাপারে সাহাবিদের পরামর্শ জানতে চাইলেন। যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে তিনি সাহাবিদের মতামত জানতে চাইতেন। বিশেষ করে এ বারের ব্যাপারটা তো একটু ভিন্ন। কেননা তারা মূলত যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হননি; বের হয়েছিলেন কুরাইশি ব্যবসায়ী কাফেলার পথরোধ করার জন্য। তাই এবার তাদের মতামতের প্রয়োজনীয়তা একটু বেশিই।

সিরিয়া থেকে কুরাইশদের যে ব্যবসায়ী কাফেলা মক্কায় ফিরছিল, তাদের অনেকে মক্কায় মুসলিমদের সম্পত্তি জবরদখল করে রেখেছিল। মুহাজির মুসলিমদের থেকে কুরাইশ কাফিররা যে সম্পদ ছিনিয়ে নিয়েছিল, তার সামান্য ক্ষতিপূরণ হিসেবে মুসলিমরা এই কাফেলাকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিতে চাইলেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন জানতে পারলেন, কাফেলাটি সিরিয়া থেকে মক্কার পথে রয়েছে, তখন তিনি মাত্র তিনশো চৌদ্দজন সাহাবিকে সাথে নিয়ে কাফেলার গতিরোধ করতে মদিনা থেকে বের হন। কিন্তু কাফেলার দলপতি আবু সুফিয়ান এই অভিযান আঁচ করতে পেরে কৌশলে পথ পরিবর্তন করেন। তিনি মুসলিমদের রোধকৃত পথ ত্যাগ করে ভিন্ন পথে দ্রুত মক্কার উদ্দেশে রওনা হন। সেই সাথে কুরাইশ নেতাদের কাছেও উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে জানিয়ে দ্রুত সংবাদ পাঠান। মক্কার সর্দাররা খবর পাওয়ামাত্র বিলম্ব না করে তাদের বাণিজ্য কাফেলা উদ্ধারের জন্য এক হাজার সদস্যের একটি বিশাল সেনাবাহিনী প্রস্তুত করে। যে বাহিনী মুসলিমদের মুখোমুখি হওয়ার জন্য মক্কা থেকে সোজা উত্তর দিকে যাত্রা আরম্ভ করে।

শত্রুপক্ষের শক্তি, অভিযানের প্রস্তুতি এবং তাদের যাবতীয় অবস্থার বিবরণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গুপ্তচর মারফত জানতে পারলেন। এরপর তিনি সাহাবিদের কাছে পরামর্শ চাইলেন—যা রাসুলের সব সময়ের রীতি। ছোটবড় যেকোনো বিরূপ পরিস্থিতির মুখোমুখি হলে তিনি সাহাবিদের সাথে পরামর্শ করতেন। উদ্ভূত পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের ব্যাপারে তাদের মতামত জানতে চাইতেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম ওই সকল স্বেচ্ছাচারী মনোভাবসম্পন্ন নেতাদের মতো ছিলেন না, যারা নিজেদেরকে সবজান্তা মনে করে; যারা সবকিছুতেই নিজেদের পারদর্শী ভাবে, নিজেদের সিদ্ধান্তই সঠিক বলে মনে করে। যারা নিজেদের ব্যাপারে আত্মতৃপ্তিতে ভোগে যে, তাদের অধীন জনগোষ্ঠীকে সঠিক পথ দেখানোর যোগ্যতা কেবল তাদেরই আছে। তাই তারা জনগোষ্ঠীকে ধ্বংস ও বিলুপ্তির পথে নিয়ে যেতে পারে এমন ঝুঁকিপূর্ণ ও নাজুক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রেও কারও কাছে পরামর্শ চাওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন এসব নেতাদের সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি মনে করতেন, একক সিদ্ধান্তবলে কখনো নেতৃত্ব চালানো যায় না। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের সুযোগ জনমনে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করে। এ জন্যই তিনি নবগঠিত ইসলামি রাষ্ট্রের এই সংকটময় মুহূর্তে সাহাবিদের কাছে পরামর্শ চাইলেন। এখানে শুধু তাদের মতামত জানা উদ্দেশ্য ছিল না; বরং তাদের ব্যক্তিত্বের প্রতি সম্মান এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই তিনি তাদের কাছে পরামর্শ চেয়েছিলেন। কিন্তু তারাও তো মানুষ। মদিনায় তাদের পরিবার-পরিজন আছে, আছে খেতখামার, ব্যবসা-বাণিজ্য। এসব ঘিরে আছে তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাও। তারা মদিনা থেকে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হননি। সংখ্যা ও অস্ত্রের বিচারে তাদের থেকে বহুগুণে বড় কোনো সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হওয়ার পরিকল্পনাও তাদের ছিল না; বরং তারা বের হয়েছিলেন বিস্তীর্ণ মরু অঞ্চলে যাওয়ার উদ্দেশ্যে, যেখানে তাদের বিন্দুমাত্র জীবনের ঝুঁকি ছিল না। তাদের ধারণা ছিল, বেশকিছু সম্পদ নিয়ে শীঘ্রই তারা মদিনায় ফিরে আসবেন।

হঠাৎ করেই পরিস্থিতি বদলে গেল। অবস্থা এমন দাঁড়াল, রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের বিনিময়ে তাদের জীবন ছিনিয়ে আনতে হবে। তাই যুদ্ধের মতো কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার আগে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সাথে পরামর্শ করা জরুরি মনে করলেন এবং গুরুত্বের সাথে তাদের মতামত জানতে চাইলেন। সেই পাথুরে মরুভূমির মাঝে বসে তিনি তার প্রিয় সাহাবিদের বিভিন্ন মতামত মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন। একটি

নীতিতে যারা আপসহীন

'যদি আমি দুনিয়াতে বিশ্বস্ত আর নীতিবান কোনো বন্ধু না পাই, তাহলে এই দুনিয়াকে বিদায় জানাব।'

ইমাম শাফিয়ি রাহিমাহুল্লাহ

আব্দুর রহমান ইবনু আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু। এই মহান সাহাবির জীবনপ্রদীপ নিভুনিভু প্রায়। উম্মুল মুমিনিন আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার পক্ষ থেকে এক ব্যক্তি তার কাছে এলেন। তিনি উম্মুল মুমিনিনের তরফ থেকে একটি আর্জি নিয়ে এসেছেন। বললেন, উম্মুল মুমিনিন আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা আবেদন করেছেন, আপনার কবর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবু বকর ও উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমার পাশে দেওয়া হোক। কিন্তু আব্দুর রহমান ইবনু আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু বিনয়ের সাথে এই আবেদন ফিরিয়ে দিলেন।

আশ্চর্য! যিনি রাসুলের জন্য নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছেন, তিনি তার শেষ ঠিকানা রাসুলের পাশে চাচ্ছেন না, এটা কী করে সম্ভব হতে পারে! কী কারণে আব্দুর রহমান ইবনু আউফ এত বড় একটি সুযোগ হাতছাড়া করলেন। কেনই-বা জেনেশুনে এমন একটি মর্যাদাপূর্ণ প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলেন!

সাহাবিগণ যে সকল মহৎ গুণের অধিকারী ছিলেন, সেগুলোর অন্যতম হলো 'বিশ্বস্ততা'। ওয়াদা রক্ষায় তারা বদ্ধপরিকর ছিলেন। বিশ্বস্ততা হলো সততার অপর নাম। সততা থেকে বিশ্বস্ততা আরও ব্যাপক। কেননা

সত্যবাদিতা শুধু মুখের কথায় প্রকাশ পায়; আর বিশ্বস্ততা বিস্তার করে থাকে কথা ও কাজের সবটুকুজুড়ে। সাহাবিরা তাদের কথা ও কাজে সমানভাবে সত্যবাদী ছিলেন। ছিলেন বিশ্বস্ত ও নিষ্ঠাবান। ঈমানের দাবিতে অটল লৌহপুরুষ। এই মহৎ গুণের কারণে তারা অন্যান্য জাতির চোখেও মর্যাদার পাত্র ছিলেন। ইসলামের প্রথম যুগে সফলতার অন্যতম কারণ এই বিশ্বস্ততা। সাহাবিদের বিশ্বস্ততার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিল।

হুদাইবিয়া। মক্কা ও মদিনার মাঝখানে একটি খোলা প্রান্তর। এখান থেকে মক্কার দূরত্ব ৮৭২ কিলোমিটার। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমরাহর উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন। কীভাবে যেন এই সংবাদ কুরাইশরা পেয়ে যায়। তাদের দৃঢ় সংকল্প—কিছুতেই মুসলিমদের মক্কায় ঢুকতে দেবে না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশদের কাছে দূত হিসেবে উসমান ইবনু আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে পাঠালেন। তাকে বলে দিলেন, 'তাদের বলবে আমরা থাকতে আসিনি, উমরাহ করেই ফিরে যাব।' উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু কুরাইশ নেতাদের সাথে আলোচনা করতে মক্কায় গেলেন।

মক্কার কুরাইশ নেতারা উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সাদরে গ্রহণ করল। তিনি ছিলেন কুরাইশদের একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের সদস্য। মক্কার অন্যতম সর্দার উমাইয়া ইবনু আব্দুস শামস গোত্রের লোক। তারা উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রস্তাব মনোযোগের সাথে শুনল। এরপর পরস্পর আলোচনায় বসল। সিদ্ধান্ত হলো, যারা একবার মক্কা ছেড়ে চলে গেছে, তাদেরকে কিছুতেই আসতে দেওয়া যাবে না। কিন্তু রাসুলের প্রস্তাব কীভাবে ফিরিয়ে দেওয়া যায়! এরমধ্যে তারা উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বাইতুল্লাহ তাওয়াফের প্রস্তাব দিলো। জবাবে তিনি তাদের প্রস্তাব কঠিনভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন। সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দিলেন, নবিজি তাওয়াফ না করা পর্যন্ত আমি তাওয়াফ করতে পারব না। কিছুতেই না।[১]

[১] মাআলিমুত তানযিল, বাগাবি, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৯৫

স্বপ্ন যাদের আকাশছোঁয়া

'তারা বলল, আসল কথা হলো, আমরা আমাদের বাপদাদাকে এমনই করতে দেখেছি।'[১]

সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণ করলেন। বেরিয়ে এলেন কুফর-শিরকের জঞ্জাল থেকে। আঁধার কেটে আলো ফুটে উঠল তার জীবনে। বাপদাদার রেখে যাওয়া মিথ্যা ধর্ম ছেড়ে দিলেন। দ্বীনের পবিত্র স্পর্শে সকল জাহিলি কর্মকাণ্ড থেকে শুদ্ধ হয়ে উঠলেন। বাতাসের পিঠে ভর করে এই খবর ছড়িয়ে পড়ল মক্কার অলিগলিতে। একসময় তার মায়ের কাছেও পৌঁছে গেল ছেলের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ।

সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু মায়ের প্রতি দুর্বল ছিলেন। মাকে প্রচণ্ড ভালোবাসতেন। তার মা এই সুযোগটি কাজে লাগালেন। নানাভাবে তাকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন। পূর্বের ধর্মে ফিরিয়ে আনতে চাপ প্রয়োগ করতে লাগলেন। কিন্তু কোনোভাবেই তিনি সাদকে একচুলও টলাতে পারলেন না। এরপর একদিন শপথ করে বসলেন, সাদ ইসলাম ছেড়ে না দেওয়া পর্যন্ত তিনি পানাহার করবেন না।

সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস মায়ের এমন অদ্ভুত প্রতিজ্ঞা শুনে হকচকিয়ে গেলেন। অব্যক্ত যন্ত্রণায় ভারী হয়ে উঠল তার অন্তর। তিনি নিজেই সে ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে—

[১] সুরা শুআরা, আয়াত : ৭৪

'আমি ছিলাম মায়ের প্রতি খুবই সহানুভূতিশীল। আমার ইসলাম গ্রহণের সংবাদ জানতে পেরে মা বললেন, সাদ, তোমার ব্যাপারে আমি এ কী শুনছি! তুমি কি সত্যিই ইসলাম গ্রহণ করেছ? তুমি ইসলাম ছেড়ে না দিলে আমি কোনো খাবার গ্রহণ করব না। পানিও ছুঁয়ে দেখব না। এভাবেই মারা যাব। এ জন্য লোকে তোমার নিন্দা করবে। মানুষ তোমাকে তোমার মায়ের হত্যাকারী বলে ডাকবে।

আমি তাকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু তিনি অনড়। নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে দিলেন। এভাবে একদিন পার হলো। তিনি খানিকটা ভেঙে পড়লেন। আরও একটি দিন কেটে গেল। তিনি খাবার, পানি কিছুই গ্রহণ করলেন না। পরদিন তিনি আরও দুর্বল হয়ে পড়লেন। আমি তাকে বললাম, 'মা, আপনি যদি এভাবে একশোবারও মৃত্যুবরণ করেন, তবু আমি এই দ্বীন ছাড়ব না। আপনার যদি ইচ্ছা হয় খান, না হয় না খেয়ে থাকুন।' তখন তিনি খাবার গ্রহণ করলেন।[১]

সাহাবিগণ ছিলেন স্বাধীনচেতা। রাসুলের সংস্পর্শে আসার পর তাদের ভাবনার জগতে এক নীরব বিপ্লব ঘটে গিয়েছিল। তাদের চিন্তাভাবনাও ছিল আকাশছোঁয়া। কারণ তারা পূর্বপুরুষের রেখে যাওয়া আঁধার ছেড়ে আলোর পথে বেরিয়ে এসেছিলেন। অন্যরা যখন পুরোনো কুসংস্কার আর জরাগ্রস্ত রীতিনীতির সামাজিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ, ঠিক সেই মুহূর্তে তারা কজন প্রথাগত রীতির অদৃশ্য পর্দা ভেদ করে কোনো এক সুতীব্র আকর্ষণে ছুটে এসেছিলেন মহাসফলতার দিকে।

ইসলাম তখন চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। এর হিরণ্ময় ছোঁয়ায় আলোকিত হয়ে উঠছে কুফরের জমাট অন্ধকার। একটি প্রদীপ থেকে জ্বলে উঠেছে শত শত হাজার হাজার দীপশিখা। সে সময় কুরাইশরা ছিল রাসুলের প্রতিবেশী। তার আপনজন। তারা কেন ইসলামে দীক্ষিত হতে পারল না। জ্ঞান-বুদ্ধিতে তো তাদের কোনো কমতি ছিল না। কোন অদৃশ্য প্রাচীরের কারণে ইসলামের স্নিগ্ধ আলোকরশ্মি তাদের কাছে পৌঁছতে পারেনি?

---

[১] তাফসির ইবনু কাসির, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৩৩৭ (সূরা লুকমান)

সে ছিল হিংসা, শুধুই হিংসা। আর কিছু নয়। যারা একমাত্র হিংসার কারণে ইসলামের রত্নভান্ডার থেকে বঞ্চিত হয়েছিল, তাদের একজন এই জাতির ফিরাউন আবু জাহল।

মক্কার প্রসিদ্ধ দুটি গোত্র বনু হাশিম ইবনু আবদু মানাফ আর বনু মাখযুম ইবনু ইয়াকযাহ। যুগ যুগ ধরে তারা বংশমর্যাদা আর কর্তৃত্ব নিয়ে লড়াই করে আসছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন বনু হাশিম গোত্রের আর আবু জাহল বনু মাখযুমের। বনু হাশিমের সাথে তাদের এই গোত্রীয় দ্বন্দ্ব বহু পুরোনো। এখন নবুয়তের মতো মর্যাদাপূর্ণ একটি বিষয় বনু হাশিমের কেউ লাভ করুক, এটা তারা সহ্য করতে পারছিল না। বনু হাশিমের এই গৌরবে বনু মাখযুমের ঘুম হারাম হয়ে গেল। হিংসায় জ্বলে যাচ্ছিল তাদের অন্তর। কতটা হিংসা আর বিদ্বেষ অন্তরে লুকিয়ে ছিল, তা আবু জাহলের একটা কথা থেকে বোঝা যায়। সে বলেছিল—

'বংশীয় সম্মান ও গোত্রীয় মর্যাদা নিয়ে আমরা আর বনু আবদু মানাফ বহুবছর ধরে লড়াই করে এসেছি। তারা কোথাও খাবারের আয়োজন করলে আমরাও করতাম। কাউকে কিছু দান করলে আমরাও দান করতাম। আমরা ছিলাম পাল্লা দেওয়া দুইজন ঘোড়সওয়ারের মতো, যারা ঘোড়ায় চড়ে জয়ের নেশায় উন্মাদের মতো ছুটছে। এখন যদি তারা বলে, আমাদের মধ্য থেকে একজন নবি আছে, যার কাছে আসমানি ওহি আসে, তখন আমরা কী উত্তর দেবো? আল্লাহর কসম! আমরা কখনোই তার ওপর ঈমান আনব না এবং তাকে সত্যায়ন করব না।'[১]

আপনি যদি কুরআন ও ইতিহাসে বর্ণিত পূর্ববর্তী সময়ের বিভিন্ন জাতি-সভ্যতা নিয়ে ভাবেন, তাহলে দেখবেন, বহু জাতি সত্যের আলো থেকে বঞ্চিত হওয়ার উল্লেখযোগ্য কারণ অন্ধবিশ্বাস এবং পুরোনো দিনের ধ্যানধারণা আঁকড়ে থাকার নিকৃষ্ট মানসিকতা। সত্যের আহ্বান এদের অন্তরে করাঘাত করেছিল, তাদের ভাবনার জগৎকে নাড়িয়ে দিয়েছিল; তবু তারা সত্যকে গ্রহণ করেনি। কারণ তারা পূর্বপুরুষের বাতিল মতবাদ এবং

[১] সিরাতে ইবনু হিশাম, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩১৫

তোমরা প্রবৃত্তির দাসত্ব করো না

‘এবং (অপরদিকে) মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে, যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজ প্রাণকে বিক্রি করে দেয়। আল্লাহ এরূপ বান্দাদের প্রতি অতি দয়ালু।’[১]

সুহাইব রুমি[২] রাদিয়াল্লাহু আনহু হিজরত করবেন বলে মনস্থির করলেন। মক্কা ছেড়ে খুব গোপনে তিনি বেরিয়ে গেলেন। তার ইচ্ছা মদিনায় তিনি রাসুলের কাছাকাছি থাকবেন। মুশরিকদের একটি দল তার পিছু নিল। তিনি বুঝতে পেরে তূণীর থেকে একটি তির উঠিয়ে তাদের দিকে ঘুরে তাকালেন। বললেন, ‘তোমরা ভালো করেই জানো, আমি তোমাদের মধ্যে সব থেকে ভালো তিরন্দাজ। আল্লাহর কসম! আমার কাছে একটি তিরও অবশিষ্ট থাকতে তোমরা আমার কাছে আসতে পারবে না। এরপরে আমি তরবারি দিয়ে তোমাদের সাথে লড়তে থাকব। তবে তোমরা যদি চাও, আমার সমস্ত সম্পত্তি তোমাদের দিয়ে দেবো। এর বিনিময়ে তোমরা আমাকে ছেড়ে দেবে।’ তারা রাজি হলো এবং তাকে ছেড়ে দেওয়ার

---

[১] সুরা বাকারা, আয়াত : ২০৭

[২] সুহাইব ইবনু সিনান রুমি রাদিয়াল্লাহু আনহু। ইসলামের প্রথম সারির একজন সাহাবি। তিনি মূলত ইরাকের অধিবাসী ছিলেন। কিন্তু রোমানরা ছোটবেলায় তাকে বন্দি করে নিয়ে এসেছিল। তাই তিনি রোমানদের মাঝে বড় হয়েছিলেন। এরপর মক্কায় চলে আসেন। তিনি তরবারি তৈরির পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। নবিজির সাথে সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। নামাজের ভেতর উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে যখন আততায়ী খঞ্জর দিয়ে আঘাত করেছিল, তারপর থেকে নতুন খলিফা নির্বাচিত হওয়ার আগ পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ের জন্য তিনি সুহাইব রুমিকে নামাজ পড়ানোর দায়িত্ব দিয়েছিলেন। সাহাবিদের মধ্যকার মতানৈক্যের সময় তিনি সকলের থেকে আলাদা ছিলেন। ৩৮ হিজরিতে তিনি মদিনায় মৃত্যুবরণ করেন।

অঙ্গীকার করল। সুহাইব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদেরকে মক্কায় তার সম্পত্তির ঠিকানা বলে দিলেন।

আবারও চলতে শুরু করলেন তিনি। তার বহু দিনের কাঙ্ক্ষিত পথে। মদিনার উদ্দেশ্যে।

পথ ফুরিয়ে এলে একসময় তিনি পৌঁছে যান মসজিদে নববিতে। এত দিনের স্বপ্ন সত্যি হলো অবশেষে। আনন্দে অস্থির হয়ে উঠলেন তিনি। তার চোখে-মুখে একরাশ ব্যাকুলতা আর মুগ্ধতা উপচে পড়ছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে নববিতেই ছিলেন। তাকে দেখে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'আবু ইয়াহইয়া, তোমরা ব্যবসা লাভজনক হয়েছে।[১] আল্লাহ তোমার ব্যাপারে আয়াত নাযিল করেছেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ -

'এবং (অপরদিকে) মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে, যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের জীবন বিক্রি করে দেয়। আল্লাহ (এরূপ) বান্দাদের প্রতি অতি দয়ালু।'[২]

ধনসম্পদের প্রতি স্বভাবগতভাবেই মানুষের আকর্ষণ রয়েছে। আল্লাহ তাঁর কিতাবে এই স্বভাবের কথা বলেছেন—

وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ -

'বস্তুত সে ধনসম্পদের প্রতি ঘোর আসক্ত।'[৩]

[১] এই ঘটনা ভিন্ন ভিন্ন শব্দে একাধিক রিওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে। ইবনু আব্দিল বার তার আল-ইসতিআব গ্রন্থে (খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৭২৯), ইবনু সাদ আত-তবকাতুল কুবরা গ্রন্থে (খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১৭১), ইবনু আসাকির তারিখে দিমাশক-এ এবং ইবনু কাসির তার আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১৭৩) -তে বর্ণনা করেছেন।

[২] সুরা বাকারা, আয়াত : ২০৭

[৩] সুরা আদিয়াত, আয়াত : ৮

সুন্নাহর অনুসরণ

'রাসুল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ করো; আর তোমাদেরকে যা থেকে নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাকো।'[১]

বদরের যুদ্ধে কুরাইশ মুশরিকরা শোচনীয় পরাজয় বরণ করেছিল। নিহত হয়েছিল তাদের নেতৃস্থানীয় অনেকে। তাই বদরের পরাজয় দুঃস্বপ্ন হয়ে তাদের তাড়া করছিল প্রতিটি মুহূর্তে। বছর না ঘুরতেই তাদের মনে প্রতিশোধের আগুন জ্বলে উঠল। কুরাইশের নতুন নেতৃবৃন্দ তিন হাজার সেনাসদস্যের একটি দুর্ধর্ষ বাহিনী গড়ে তুলল। এরপর দেরি না করে মদিনার উদ্দেশে শুরু হলো তাদের যুদ্ধযাত্রা।

দ্রুত খবর পৌঁছে গেল মদিনায়। সকলে সতর্ক হয়ে উঠলেন। পরিস্থিতির ভয়াবহতা আঁচ করতে পেরে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও যুদ্ধযাত্রার ঘোষণা দিলেন। সাথে সাথে তার চিরায়ত অভ্যাস অনুযায়ী সাহাবিদের সাথে সমরকৌশল নিয়ে একটি পরামর্শসভা ডাকলেন। প্রথমে তিনি মুসলিমদের করণীয় জানতে চাইলেন। সবার কাছে প্রশ্ন রাখলেন, মদিনার বাইরে গিয়ে শত্রুদের মোকাবিলা করবে, নাকি মদিনায় থেকেই প্রতিহত করবে? রাসুলের ব্যক্তিগত মতামত ছিল মদিনায় থেকেই যুদ্ধ করা। এতে মদিনা নিরাপদ থাকবে। যদি শত্রুসেনারা কোনোভাবে মদিনায় ঢুকতে চায়, তাহলে তারা মদিনার প্রত্যেকটি প্রবেশমুখে লড়াইয়ের

---

[১] সুরা হাশর, আয়াত : ৭

মুখোমুখি হবে; আর মহিলারা ঘরের ছাদে উঠে তাদেরকে প্রতিহত করবে।[১] প্রবীণ সাহাবিদের অনেকেই এই মত সমর্থন করলেন। তবে অধিকাংশ নওজোয়ান সাহাবি—যারা বদরে অংশগ্রহণের সুযোগ পাননি, তাদের পরামর্শ ছিল, মদিনার বাইরে গিয়ে কাফিরদের সাথে লড়াই করা। তারা এই সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি শুরু করলেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মজলিস ছেড়ে উঠে ঘরে গেলেন। এরপর যুদ্ধের পোশাক পরে বেরিয়ে এলেন। যারা মদিনার বাইরে গিয়ে শত্রুর মোকাবিলার জন্য পীড়াপীড়ি করছিলেন, রাসুলকে দেখে তারা খানিকটা লজ্জিত হলেন। ভাবলেন, রাসুলুল্লাহ যা চাচ্ছিলেন না, তা নিয়ে পীড়াপীড়ি করা উচিত হয়নি। এগিয়ে গেলেন তাদের একজন। বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আপনি যেভাবে চাচ্ছেন, আমরা সেভাবেই যুদ্ধ করব। মদিনায় অবস্থান করেই আমাদের যুদ্ধ করা উচিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জবাবে বললেন, 'কোনো নবির জন্য যুদ্ধের পোশাক পরার পর আল্লাহর পক্ষ থেকে তার এবং শত্রুর মাঝে ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত সেই পোশাক খুলে ফেলা সমীচীন নয়।'[২]

মদিনা থেকে উত্তর দিকে উহুদ পাহাড়। মুসলিম সেনাবাহিনী মদিনা থেকে বের হয়ে উহুদের পাদদেশে এসে অবস্থান নিলেন। তারা পাহাড় পেছনে রেখে দাঁড়িয়ে গেলেন। শত্রুসেনাদের সংখ্যাধিক্যের কথা মাথায় রেখে যুদ্ধের ছক আঁকলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর[৩] নেতৃত্বে পঞ্চাশজন দক্ষ তিরন্দাজ নিয়ে একটি বাহিনী গঠন করলেন। মুসলিম সেনাবাহিনীর পেছন দিকে উহুদ পাহাড়ের মাঝ বরাবর একটি গিরিপথ ছিল। সেখানের একটি ছোট পাহাড়ের ওপর তিরন্দাজদের এই দলটিকে নিযুক্ত করলেন। পরবর্তী সময়ে এ পাহাড়ের নাম হয়ে যায় 'জাবালুর রুমাত'। এখানে এই দলটিকে নিযুক্তির উদ্দেশ্য ছিল পেছন থেকে মূল বাহিনীকে শত্রুর আক্রমণ থেকে

[১] যাদুল মাআদ, ইবনুল কাইয়িম জাওযিয়্যাহ, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১৯৩ (মুআসসাসাতুর রিসালা)
[২] আস-সুনানুল কুবরা, ইমাম বাইহাকি, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৪০, হাদিস : ১৩৬৬১
[৩] আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর আউসি আনসারি রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি সেই সাতজনের একজন, যারা দ্বিতীয় বাইআতে আকাবায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি একজন বদরি সাহাবি।

রক্ষা করা। যেন মূল বাহিনীর পেছনের অংশটা পুরোপুরি নিরাপদ থাকে এবং যেকোনো সমস্যায় পড়লে বাহিনী সেখানে গিয়ে আশ্রয় নিতে পারে, আত্মগোপন করতে পারে।[১]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই বাহিনীকে তাদের নির্ধারিত স্থানে অবস্থান করার জন্য দৃঢ়ভাবে আদেশ দিয়েছিলেন। তার অনুমতি ছাড়া ওই স্থান ত্যাগ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছিলেন। এমনকি যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই রণকৌশল সম্পর্কে তাদেরকে বলেছিলেন—

‘তোমরা আমাদের পেছন থেকে নিরাপত্তা দেবে। যদি দেখো আমরা হতাহত হচ্ছি, তবুও তোমরা আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে না। আর যদি দেখো, আমরা যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তি জড়ো করছি, তাহলেও তোমরা আমাদের সাথে শরিক হবে না।’[২]

সহিহ বুখারির বর্ণনায় আছে—

‘তোমরা যদি দেখো, আমাদের লাশের ওপর শকুন উড়ে বেড়াচ্ছে, তবুও তোমরা আমার অনুমতি ছাড়া তোমাদের জায়গা থেকে একবিন্দুও নড়বে না। আর যদি দেখো, আমরা শত্রুকে পদানত করেছি, তবুও আমার অনুমতি ছাড়া তোমরা স্থান ত্যাগ করবে না।’[৩]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রণকৌশল ছিল অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও চমৎকার। প্রতিটি যুদ্ধেই তার সামরিক নেতৃত্বের অসামান্য যোগ্যতার প্রকাশ ঘটেছে। উহুদের ময়দানে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রের সব থেকে ভালো জায়গাটি বেছে নিয়েছিলেন। মুসলিম বাহিনীর পেছনের বড় অংশ এবং ডান দিকটা পাহাড়ের কারণে নিরাপদ ছিল; আর বাম পাশ এবং পেছনের খানিকটা অংশ গিরিপথের কারণে ছিল অরক্ষিত। এ অংশের নিরাপত্তার জন্যই তিনি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। সেখানে তিরন্দাজদের দলটিকে নিযুক্ত করে পেছন থেকে আক্রমণের রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

[১] আর-রাসুলুল কাইদ, মাহমুদ আল-মাউসিলি, পৃষ্ঠা : ১৭৬ (দারুল ফিকির)
[২] মুসতাদরাকে হাকিম, হাকিম নিশাপুরি, হাদিস : ৩১৬৩
[৩] সহিহ বুখারি, হাদিস : ৩০৩৯

ত্যাগের মহিমায় ভাস্বর যারা

'মুমিনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে। তাদের কেউ কেউ মৃত্যুবরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষায় আছে। তারা তাদের সংকল্প মোটেই পরিবর্তন করেনি।'[১]

উহুদ পাহাড়ের পাদদেশে এক বিস্তীর্ণ প্রান্তর। এখানে একটু আগেও ঘটিত যুদ্ধের ধূলিঝড় এখন থেমে গেছে। কিছুক্ষণ আগেও চলমান রক্তক্ষয়ী পরিবেশ এখন শান্ত। সবার চোখেমুখে অব্যক্ত বেদনা, ক্লান্তির ছাপ। তাদের অনেকেই শহিদ হয়েছেন। আহত হয়েছেন তার চেয়েও বেশি। স্বজন হারানোর ব্যথায় মুষড়ে পড়েছেন তারা। এমন সময় দেখা গেল, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উঠে দাঁড়ালেন। চলতে শুরু করলেন তিনি। সাহাবিরাও তাকে অনুসরণ করলেন। ঘুরে ঘুরে তিনি শহিদদের দেখছেন। হঠাৎ সবার দৃষ্টি পড়ল একটি যুবকের দিকে। রক্তে ভিজে আছে পুরো শরীর। কাটা দুই হাত পাশেই পড়ে আছে। মলিন চেহারা। দেখে মনে হচ্ছে, বড় কঠিন জীবন ছিল তার। খুব কষ্ট নিয়ে তিনি দুনিয়া ছেড়েছেন। কাফন দিতে হবে তাকে। কিন্তু একটি ছোট চাদর ছাড়া আর কিছুই যে নেই তার! এটা দিয়ে তো পুরো শরীর ঢাকা সম্ভব নয়। মাথা ঢাকলে পা খুলে যায়, পা ঢাকতে গেলে মাথা উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাদর দিয়ে মাথা ঢেকে দেওয়ার আদেশ দিলেন আর বললেন, 'ঘাস দিয়ে পা ঢেকে দাও'।[২]

---

[১] সুরা আহযাব, আয়াত : ২৩

[২] সহিহ বুখারি, হাদিস : ৩৮২১

কে এই নওজোয়ান, দুনিয়া ছেড়ে গেলেন, অথচ তার পুরো শরীর ঢাকার মতো এক টুকরো কাপড়ও পাওয়া যায়নি! কেনই-বা তার বিয়োগব্যথায় আল্লাহর রাসুল এবং সাহাবিরা এতটা ভেঙে পড়েছিলেন?

এই যুবকের ঘটনা জানতে হলে আমাদেরকে সময়ের হিসাবে দশ বছর পেছনে ফিরে যেতে হবে। উহুদের বিস্তীর্ণ প্রান্তর ছেড়ে আমাদেরকে ঘুরে আসতে হবে মদিনা থেকে দক্ষিণের একটি শহর থেকে। হ্যাঁ, সেই শহরটিই মক্কা মুকাররমা। এই শহরের নেতৃত্বে ছিল তখন কুরাইশ গোত্র। তারা নিজেদের মাঝেই শহরের সকল দায়িত্ব ভাগ করে নিয়েছিল। সামাজিক কর্মকাণ্ড থেকে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত—সব তারাই আঞ্জাম দিত। আরব উপদ্বীপে মক্কা ছিল ধর্মীয় দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান এবং ব্যবসার উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র। কুরাইশদের শাখা গোত্রগুলোর মধ্যে বড় বড় গোত্রগুলো একেকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বেছে নিয়েছিল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—

সিকায়াহ: হাজিদের পানি পান করানো এবং তাদের জন্য পানির সুব্যবস্থা রাখা। এটা একদিকে যেমন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও সম্মানজনক দায়িত্ব, অন্যদিকে তেমনই কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ। কেননা মক্কায় পানির খুব সংকট ছিল এবং পাহাড়ি গিরিপথের উঁচুনিচু রাস্তা দিয়ে পানি বহন করাটাও ছিল বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। সেই সাথে আরবের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত হাজিদের সংখ্যাও ছিল অনেক বেশি। এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করত বনু হাশিম। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গোত্র। রাসুলের চাচা আব্বাস ইবনু আব্দুল মুত্তালিব ছিলেন এ দায়িত্বের প্রধান।

রিফাদাহ: হাজিদের খাবারের সুব্যবস্থা করা। এর সকল ব্যয়ভার কুরাইশরা বহন করত। হজের মৌসুমে মক্কার অধিবাসীরা এ বিষয়টি খুব গুরুত্বের সাথে দেখত। এ জন্য তারা সবার কাছ থেকে সাধ্য অনুযায়ী অর্থ সংগ্রহ করত। বড় অঙ্কের অর্থ জমা হলে তা দ্বারা হাজিদের খাবারের ব্যবস্থা করা হতো। এই দায়িত্ব ছিল বনু নওফেল গোত্রের। মুতয়িম ইবনু আদি ছিলেন এই গোত্রের লোক। তিনি মক্কায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে

জুলুমের ব্যাপারে সর্তক যারা

‘বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, সীমালঙ্ঘন করবে না, প্রতারণা করবে না, প্রতিকৃতি স্থাপন করবে না, ছোট শিশু, বৃদ্ধ ব্যক্তি এবং নারীদেরকে হত্যা করবে না। খেজুরগাছ কাটবে না। ফসল জ্বালিয়ে দেবে না। কোনো ফলদার বৃক্ষ কাটবে না। খাদ্যের প্রয়োজন ছাড়া বকরি, গাভি এবং উটনী জবাই করবে না। শীঘ্রই তোমরা এমন সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে, যারা তাদের জীবন বিভিন্ন উপাসনালয়ে উৎসর্গ করেছে। তাদেরকে তাদের অবস্থায় ছেড়ে দেবে এবং তাদের উপাসনালয়ের ওপর কোনো হামলা করবে না।’[১]

—আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু

অল্পদিন হলো উহুদ যুদ্ধ শেষ হয়েছে। পরাজয়ের ক্ষত এখনো শুকায়নি। স্বজন হারানোর ব্যথাও তারা ভুলতে পারেননি। কোনো কাজেই মন বসছে না তাদের। চোখেমুখে শোকের ছাপ স্পষ্ট। এই তো মাস কয়েক হয়েছে। এরই মধ্যে আরবের বিভিন্ন গোত্র মুসলিমদের সাথে পরিষ্কারভাবে শত্রুতার ঘোষণা দিলো। বদর যুদ্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল হলো, এ সকল গোত্রের কাছে যখন সংবাদ পৌঁছল যে, মুসলিমরা আরবের সবচেয়ে প্রভাবশালী গোত্র কুরাইশের ওপর জয়লাভ করেছে, তখন তাদের মনে মুসলিমদের প্রতি একধরনের ভয় ও শ্রদ্ধামিশ্রিত অবস্থান তৈরি হয়েছিল। কিন্তু উহুদের সাময়িক বিপর্যয়ের পর মুসলিমরা তাদের সেই আঞ্চলিক

[১] তারিখুত তাবারি, ইবনু জারির তাবারি, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ২২৭ (দারুত তুরাস)

প্রভাব হারিয়ে ফেললেন। সেই দুঃসময়ে আরবের বিভিন্ন গোত্রের পক্ষ থেকে মুসলিমরা বিভিন্ন ধরনের চক্রান্ত, ষড়যন্ত্রমূলক আক্রমণ এবং গোপন হামলার শিকার হয়েছিলেন। তারা ধারণা করেছিল, মুসলিমরা নিজেদের সেই শক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। তারা দুর্বল হয়ে পড়েছেন। ইসলাম ও মদিনাকে রক্ষা করার মতো ক্ষমতা এখন আর তাদের নেই। কিন্তু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার সাহাবিরা ছিলেন পাহাড়সম মনোবলের অধিকারী। হতাশা কী জিনিস, তারা জানতেনই না। অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও সাহসিকতার সাথে তারা সেসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেছিলেন।

খন্দকের যুদ্ধ শেষে মুশরিকরা মক্কায় ফিরে গেছে। এতদিন মদিনা অবরোধ করে রেখেও তারা সেখানে প্রবেশ করতে পারেনি। তখন আশপাশের গোত্রগুলো আবারও মুসলিমদের সামরিক শক্তির ব্যাপারে ভাবতে শুরু করল। তারা মুসলিমদের সাথে শান্তিচুক্তিতে আগ্রহী হয়ে উঠল। একের পর এক সন্ধির প্রস্তাব আসতে থাকল প্রতিবেশী গোত্রগুলোর পক্ষ থেকে। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই ঐতিহাসিক কথাটি বলেছিলেন—

‘এখন থেকে আমরাই তাদের অক্রমণ করব, তারা আর আমাদের সাথে যুদ্ধ করতে আসবে না।’[১]

গাযওয়ায়ে উহুদ থেকে খন্দক পর্যন্ত সময়টা মুসলিমদের জন্য বেশ কঠিন ছিল। একই মাসে পরপর দুইটি বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটেছিল। অল্প দিনের ব্যবধানে তারা বহুসংখ্যক সাহাবিকে হারিয়েছিলেন। যাদের সংখ্যা উহুদের শহিদদের চেয়েও বেশি ছিল।

[১] সহিহুল বুখারি, হাদিস : ৪১১০

আত্মনিয়ন্ত্রণ

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে (শত্রুশিবিরের খোঁজ নেওয়ার) দায়িত্ব দিয়ে বললেন, 'তোমার কাজ শুধু তথ্য সংগ্রহ করা। নিজ থেকে কোনো সিদ্ধান্ত নেবে না।' আমি যখন সেনাছাউনির কাছাকাছি এলাম, দেখলাম দূরে আগুন জ্বলছে। আগুনে হাত বাড়িয়ে তাপ নিচ্ছে কালো এক মোটা লোক। সে কোমরে হাত বুলাচ্ছে আর বলছে—চলো, ফিরে যাই আমি এর আগে কখনো আবু সুফিয়ানকে দেখিনি, তাকে চিনতাম না। আমি ধনুকের ওপর তির বসিয়ে ছুড়তে উদ্যত হলাম। তখনই আমার রাসুলের আদেশের কথা মনে পড়ে গেল। আমি হাত গুটিয়ে নিলাম। যদি আমি তির নিক্ষেপ করতাম, তাহলে তা লক্ষ্যভেদ করত।'[১]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকাল হয়ে গেল। মুসলিমরা অত্যন্ত মর্মাহত হলেন, তারা অতিশয় দুঃখে কাতর। অনেকেই এ সংবাদ বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। কেউ কেউ তো তীব্র শোকে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলছিলেন। যেন তারা ভুলে গিয়েছিলেন—রাসুলুল্লাহও একজন মানুষ। তাকেও একদিন ইন্তিকাল করতে হবে। এমনকি উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো একজন কঠোর, বিচক্ষণ ও তীক্ষ্ণ বিবেচনাবোধসম্পন্ন মানুষও রাসুলের মৃত্যুর সংবাদ প্রচার করতে লোকদেরকে নিষেধ করছিলেন। তিনি সবাইকে ডেকে ডেকে বলছিলেন,

[১] ফিকহুস সিরাহ, গাযালি, পৃষ্ঠা : ৩১০ (দারুল কলম)

'রাসুলুল্লাহ মৃত্যুবরণ করেননি। তাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে ডেকে নেওয়া হয়েছে। যেভাবে মুসা আলাইহিস সালামকে ডেকে নেওয়া হয়েছিল। তিনি কওমের মাঝ থেকে চল্লিশ দিন অনুপস্থিত ছিলেন। আল্লাহর কসম! রাসুলুল্লাহ বেঁচে আছেন। আমি আশা করি, অবশ্যই তিনি সেই মুনাফিকদের হাত ও জিহ্বা কেটে দেবেন, যারা ধারণা করেছে তিনি মারা গেছেন।'[১]

মুসলিমদের ইতিহাসে এতটা দুঃখজনক ও বেদনাদায়ক মুহূর্ত আর আসেনি। রাসুলের বিয়োগব্যাথায় তারা মুষড়ে পড়েছেন। প্রচণ্ড শোকে সবাই কাতর। কিন্তু তাদের যে এখন অনেক বড় চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে! কারণ রাসুলুল্লাহর মৃত্যুসংবাদ শোনামাত্রই ইসলামের শত্রুরা চক্রান্তে মেতে উঠতে পারে। ইতোমধ্যে উত্তরে রোম সাম্রাজ্য মুসলিমদের বিরুদ্ধে পাঁয়তারা শুরু করে দিয়েছে। আরবের বিভিন্ন গোত্রও খুঁজছে তাদের দুর্বলতার সুযোগ। এই শোকার্ত পরিস্থিতিকে তারা নিজেদের শত্রুতা ও ঔদ্ধত্য প্রকাশে ব্যবহার করতে পারে। এ অবস্থায় যদি রাসুলের প্রথম অনুসারী অর্থাৎ সাহাবিরা শোকের তীব্রতায় মানসিক শক্তি হারিয়ে ফেলতেন, আবেগ-অনুভূতির কাছে পরাজিত হতেন এবং তাদের ঈমান ও দ্বীনের বুঝ এর দ্বারা প্রভাবিত হতো, তাহলে রাসুলের রেখে যাওয়া রিসালাতের দায়িত্ব ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারত। অথচ তিনি হলেন সর্বশেষ রাসুল এবং তার রিসালাত মানুষের জন্য সর্বশেষ আসমানি পয়গাম।

মুসলিমদের মধ্যকার এ পরিস্থিতি সামলে নেওয়ার জন্য প্রয়োজন ছিল একজন বিচক্ষণ ও স্থিরচিত্ত নেতার। আল্লাহ তাআলা বিশেষ অনুগ্রহে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এ কাজের জন্য প্রস্তুত করে দিলেন। তিনি ছিলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সব থেকে নিকটতম ও ঘনিষ্ঠ সহচর। তা সত্ত্বেও তিনি দৃঢ়তার সাথে নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, মুসলিমদের মানসিক অবস্থা যদি ভেঙে পড়ে, তাহলে এটা তাদের জন্য অনেক বড় ক্ষতি বয়ে আনবে। তার কাছে রাসুলুল্লাহর ইন্তিকালের খবর পৌঁছলে তিনি সারা জীবনের সঙ্গীকে

[১] সহিহ ইবনু হিব্বান, হাদিস : ৬৮৭৫ (মুআসসাসাতুর রিসালা)

শেষবারের মতো দেখার উদ্দেশ্যে বের হলেন। এলেন তার মেয়ে উম্মুল মুমিনিন আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার ঘরে। এ ঘরকেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবনের শেষ দিনগুলোকে কাটানোর জন্য বেছে নিয়েছিলেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুলের চেহারা থেকে কাপড় সরিয়ে কপালে চুমু দিলেন। তার বিদায়ে ডুকরে কেঁদে উঠলেন। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে বের হয়ে মুসলিমদের উদ্দেশে বললেন,[1] যে ব্যক্তি মুহাম্মাদের ইবাদত করত সে জেনে রাখুক, মুহাম্মাদ মৃত্যুবরণ করেছেন; আর যে আল্লাহর ইবাদত করে, সে জেনে রাখুক, আল্লাহ চিরঞ্জীব, তিনি মৃত্যুবরণ করবেন না। এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন—

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ -

'নিশ্চয় আপনি মৃত্যুবরণ করবেন এবং তারাও মৃত্যুবরণ করবে।'[২]

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ -

'আর মুহাম্মাদ তো একজন রাসুলমাত্র। তার পূর্বেও বহু রাসুল অতিবাহিত হয়েছেন। তাহলে কি তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন, তবে কি তোমরা পশ্চাদপসরণ করবে? বস্তুত কেউ যদি পশ্চাদপসরণ করে, তবে সে আল্লাহর কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না। আর যারা কৃতজ্ঞ, আল্লাহ তাদের সাওয়াব দান করবেন।'[৩]

জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে মানুষ বিভিন্ন অবস্থার মুখোমুখি হয়ে থাকে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে কখনো সে খুশি হয়, কখনো ব্যথিত; কখনো রাগান্বিত হয়, কখনো হাসে, কখনো কাঁদে। অর্থাৎ অবস্থাভেদে মানুষের স্বভাবগত প্রকৃতি

[১] সহিহুল বুখারি, হাদিস : ৩৬৬৭
[২] সুরা যুমার, আয়াত : ৩০
[৩] সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৪৪